সংহতি ও কালিকলম পত্রিকার বিস্মৃত সম্পাদক মুররলীধর বসু (১৮৯৭ - ১৯৬০)

জগন্নাথ ঘোষ

১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রকাশিত হল দুটি বাংলা মাসিক পত্রিকা 'কল্লোল' এবং 'সংহতি'। কল্লোলের সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ আর সহঃ সম্পাদক ছিলেন গোকুল নাগ। দীনেশরঞ্জন এবং গোকুল নাগ ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তাঁরা উভয়েই ছিলেন সাহিত্যপ্রাণ। তাঁরা নবীন লেখকদের আত্মপ্রকাশের দুর্লভ সুযোগ করেছেন। এই নবীন লেখকরাই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের পট পরিবর্তন ঘটান। কল্লোলের অন্যতম লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে কল্লোলের মহিমা বর্ণনা করে লিখেছেন, ''কল্লোল বলতেই বুঝতে পারি সেটা কি? উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।''

'কল্লোল' যথার্থই তার প্রকাশ মুহূর্তেই 'আলোড়ন' তুলেছিল। সেই বিদ্রোহ ও আলোড়নের পাশেই প্রকাশ পেল 'সংহতি'। সংহতির ব্যাখ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন— ''সংহতি তো শিলীভূত শক্তি। সংঘ, সমূহ গণগোষ্ঠী। যে গুণের জন সহধর্মী পরমাণুসমূহ জমাট বাঁধে, তাই তো সংহতি। আশ্চর্য নাম। আশ্চর্য সেই নামের তাৎপর্য।''

'সংহতি'র সম্পাদক ছিলেন দুজন - জ্ঞানাঞ্জন পাল এবং মুরলীধর বসু। জ্ঞানাঞ্জন পাল ছিলেন বিশিষ্ট বাগ্মী ও জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র। বিপিনচন্দ্রের কাছে একদা এসে হাজির হলেন জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার ছাপাখানার কর্মী। ছাপাখানায় কাজ করতে করতে তাঁর শরীর ভেঙে যায়। তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু ছিল কর্মচারী ও শ্রমিক সাধারণের স্বার্থ সংগঠনের ঐকান্তিক আগ্রহ।

জিতেন্দ্রনাথ তখন সদ্য স্ত্রীহারা। তিনি থাকতেন ১ শ্রীকৃষ্ণলেন, বউবাজার। তাঁর দেড়খানা ঘরের একখানায় হল 'সংহতি'র আশ্রয়।

সংহতির জন্মলগ্নের কথা বিবৃত করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে। জিতেন্দ্রনাথের সংগে পরিচয় ছিল বিপিনচন্দ্র গ্রন্থে। জিতেন্দ্রনাথের সংগে পরিচয় ছিল বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র জ্ঞানাঞ্জনের। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে একদিন জিতেন্দ্রনাথ এসে হাজিরর হল বিপিনচন্দ্র পালের বাড়ি। বিপিনচন্দ্রকে তিনি বিনা ভূমিকায় বলেছিলেন তিনি শ্রমজীবীদের জন্য একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা বের করতে চান। এ ব্যাপারে তিনি বিপিনচন্দ্রের সাহায্যপ্রার্থী। বলাবাহুল্য বিপিনচন্দ্র এক - কথায় জিতেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। পত্রিকার নামকরণ করেন বিপিনচন্দ্রই। ঠিক হল, পত্রিকার সম্পাদক হবেন জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসু। এরাও দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনেই লেখালেখি করতেন।

মুরলীধর ইতিহাসে এম.এ পাশ করে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা শুরু করেছেন ১৯২২ সালে মাঝামাঝি। তখনই নবীন লেখকদের সঙ্গে তার পরিচয় হতে শুরু করেছে। সাহিত্যরচনাও চলেছে সেই সঙ্গে। জ্ঞানাঞ্জন পাল ছিলেন তাঁর এম. এ. ক্লাসের সহপাঠী বন্ধু। সেই সুবাদে তাঁদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন মুরলীধর। তার ফলে তিনি বিপিনচন্দ্রের স্নেহধন্য। 'সংহতি'র সম্পাদনার দায়িত্ব পেতে মুরলীধরের কোনও অসুবিধা হয়নি।

'সংহতি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দে বৈশাখে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল তিন আনা, বার্ষিক সড়াক মূল্য দু টাকা। পত্রিকার প্রচ্ছদের শিরোদেশে লেখা হল— 'শ্রমজীবীদের পত্র'। পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ হলেন 'সংহতি'-র প্রতিষ্ঠাতা জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবিতা লিখনে কবি কামিনী রায়। তাঁর কবিতার নাম—'দুর্বলের ক্রন্দন'। এছাড়া লেখক তালিকায় ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, জ্ঞানাঞ্জন পাল, গিরীন্দ্রশেখর বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং মুরলীধর বসু। মোট ৫২ পাতার পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'সংহতি'-র আদর্শ। এটি লেখেন জ্ঞানাঞ্জন পাল। 'সংহতি' কেন প্রকাশ করা হল, তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই লেখায়। বিপিনচন্দ্রর লেখাটির নাম 'গরীবের আকাঙ্খা'। অন্যতম সম্পাদক মুরলীধর বসুর রচনাটির নাম 'সঙ্গের সাথী'। এই রচনাটি বিশিষ্ট লেখক ম্যাক্সি গোর্কির 'কমরেড' গল্পের অনুবাদ। ম্যাক্সিম গোর্কির গল্পটির অনুবাদের মধ্যে ধরা পড়েছে শ্রমজীবীদের মুখ্যপত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ।

'সংহতি'-র সম্পাদকরা মুখ্যত ঃ গুরুত্ব দিয়েছিলেন শ্রমজীবীদের সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ ও আলোচনাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে এই পত্রিকায় মুদ্রিত হতে লাগল গল্প কবিতা উপন্যাস। কল্লোলের নবীন লেখকরাই এগিয়ে এলেন 'সংহতি' -র দপ্তরে তাঁদের গল্প উপন্যাস পৌঁছে দেবার জন্য। এই লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতিরা।

'সংহতি'-র প্রথমবর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ। তার নাম 'সংহতি'। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সংহতি' পত্রিকার প্রদান উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ করেছেন।

দ্বিতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আর একটি রচনা প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য, এটি তৎকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসভায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, পারিবারিক দুশ্চিন্তা এবং সেই সঙ্গে আর্থিক দায়ভারের চাপের মধ্যেও মুরলীধর পরম উৎসাহে 'সংহতি'-র সম্পাদনা কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইতিমধ্যে 'সংহতি'-র কর্মাধ্যক্ষ জিতেন্দ্রনাথ গুপ্তের মৃত্যু হলে মুরলীধরের উপরে বর্তায় কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, 'সংহতি'র অফিস উঠে এল তারই ঠিকানায়। তখন মুরলীধর বাস করতেন ভবানীপুরে ১০ রূপচাঁদ মুখার্জি লেনে। আবার মুরলীধর ভবানীপুরের ঐ বাসা উঠিয়ে যখন চলে াসেন ১৬২/২ রসা রোডে, তখনও 'সংহতি'-র অফিস উঠে এল এই ঠিকানায়। অবশ্য বিশেষ কাজের চাপে বিব্রত হয়ে মুরলীধর 'সংহতি'-র দ্বিতীয় বছরের শুরুতে সম্পাদনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন কেশবেশ্বর বসু। সম্পাদনার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে পরিত্যাগ করলেও মুরলীধর 'সংহতি'-র দ্বিতীয় বছরের শুরুতে মুরলীধর 'সংহতি'-র জন্য লেখা জোগাড় করা এবং সেই সঙ্গে আরও নানা আনুষঙ্গিক কাজ নিয়মিত চালিয়ে যেতেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যাই 'সংহতি'-র শেষ সংখ্যা। 'সংহতি' বন্ধ হলেও রেখে গেছে শ্রমজীবীদের বাঁচার জন্য লড়াই -এর প্রতিশ্রুতি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'সংহতি' যখন শ্রমজীবীদের নিয়ে ভাবনা শুরু করেছে, তখনও এদেশে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়নি।

'সংহতি' যখন প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তখন মুরলীধর নিয়মিত যাতায়াত করেন 'কল্লোল' ও 'বিজলী' পত্রিকার দপ্তরে। তিনি 'বিজলী' -র লেখক ছিলেন। এই পত্রিকার সহ সম্পাদক সুবোধ রায় ছিলেন মুরলীধরের সহপাঠী বন্ধু। মুরলীধর সেই সূত্রে 'বিজলী'-র জন্য সম্পাদকীয় অনেক কাজ করে দিতেন। অনুরূপভাবে তিনি 'কল্লোল' -র আড্ডাতেও নিয়মিত থাকতেন। 'কল্লোলে'-র তরুণ লেখরা ছিলেন মুরলীধরের আপনজন। 'কল্লোল' পত্রিকার জন্যও তিনি অনেক সম্পাদকীয় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় পালন করতেন। তাঁর স্ত্রী নীলিমা বসু

সৃষ্টিসন্ধান

ছিলেন 'কল্লোলে'-র অন্যতম লেখিকা।

'কল্লোল' পত্রিকারর চতুর্থ বর্ষের শুরুতে অর্থাৎ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখেই 'কল্লোল' -রের কয়েকজন লেখক স্থির করেন তাঁরা আর একটি পত্রিকার প্রকাশ ঘটাবেন। সেই প্রকাশিতব্য পত্রিকার নাম হবে 'কালিকলম'। নামকরণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের।

'কালিকলমে'-র প্রকাশের কারণ ব্যাখা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, 'কিন্তু প্রেমেন শৈলজার অর্থের প্রয়োজন তখন অত্যন্ত। তাই তারা ঠিক করলেন আলাদা একটা কাগজ বের করবে। সেই কাগজে ব্যবস্থা করবে অশনাচ্ছাদনের।"

'কালিকলম' প্রকাশিত হল ১৩৩৩ -এর বৈশাখে। এই পত্রিকা গল্প কবিতার মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক হলেন একসঙ্গে তিনজন— প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মুরলীধর বসু। পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ হলেন বরদা এজেন্সির মালিক শিশিরকুমার নিয়োগী। ১৩৩৪ -এ বৈশাখ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করলেন। আবার দ্বিতীয় বর্ষের শেষ দিকে শৈলজানন্দও সম্পাদনার দায়িত্বব আর কাঁধে রাখলেন না। পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ থেকে সম্পাদনার দুরূহ ব্রত পালন করলেন একাই মুরলীধর। দুঃখের বিষয, চতুর্থ বর্ষের প্রথম ছয় মাস অর্থাৎ ১৩৩৬ -র বৈশাখ থেকে আশ্বিন, 'কালিকলম' প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তী চারমাসে চারটি সংখ্যা বেরোবার পর 'কালিকলম' চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে ১৩৩৪ -এর পৌষ মাসের সংখ্যাই 'কল্লোলে'-র শেষ সংখ্যা।

'কালিকলম' প্রকাশের শর্ত ছিল সম্পাদক তিনজন এবং কর্মাধ্যক্ষ প্রত্যেকেই মাথাপিছু দুশো টাকা করে চাঁদা দেবেন, পরিবর্তে শিশিরকুমার নিয়োগীর বরদা এজেন্সিকে একটি করে উপন্যাস দেবেন। কালিকলমের প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হয় এক হাজার কপি। তিনদিনের মধ্যে সব কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

কল্লোলের লেখরাই ছিলেন কালিকলমের লেখক। এই লেখক তালিকায় ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, কাজি নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বসু, জগদীশ গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও কাজি নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ সেন, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির গান এবং তাঁদের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়াও নিয়মিত ছবিও ছাপা হয়েছে এই পত্রিকায়।

'কালিকলমে'-র দুঃসময় শুরু হয় পত্রিকার তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে। দেনার দায় বহন করা যখন দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তখন স্বাভাবিক কারণেই 'কালিকলম' বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 'কালিকলম' রেখে গেছে বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্থায়ী মহিমা। 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গেই উচ্চারিত হয় কালিকলম' -এর নাম। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রকাশের কথা প্রথম ভাবেন। তাঁরা তাঁদের অর্থাভাব ঘোচাবার জন্য এই পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করে থাকতে পারেন হয়ত। তার থেকেও বড়ো কথা, তাঁদের সৃষ্টিশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য শুধু 'কল্লোল' নয়, আরও মাধ্যমের দরকার হচ্ছিল। অতএব 'কালিকল' - প্রকাশিত হল। এই দুই পত্রিকার লেখকরাই আধুনিক পর্বের বাংলা সাহিত্যের সূতিকাগৃহের কাজ করেছে। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' -এর সম্পাদদের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন 'স্বপ্নদর্শী'। বলাবাহুল্য তাঁদের স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল।

'কল্লোল' ও 'কালিকলম' বন্ধ হয়ে গেলে, 'কল্লোলে' -র দীনেশরঞ্জন দাশ চলচ্চিত্র জগতে পা বাড়ালেন। আর মুরলীধর শিক্ষকতার সংগে বন্ধু শৈলজানন্দের চিত্র প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হলেন।

মুরলীধর তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে আর একটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তার নাম 'তরুণের স্বপ্ন'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মালবিকা দত্ত। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। মুরলীধরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীর্ঘ দিনের। তারই আগ্রহে 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্মে নিযুক্ত হন মুরলীধর। তাঁর মাসিক পারিশ্রমিক ছিল পঞ্চাশ টাকা। এই পত্রিকায় যোগদানের পর এখানেও তৈরি হল এক সাহিত্যের আড্ডা। তৎকালীন সাহিত্যের স্মরণীয় লেখকরা এই আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দিতেন। লেখকদের নিয়েই পত্রিকা। সম্পাদক সেই সব লেখকদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেবেন। সাময়িক পত্র চিরকাল এই কাজ করে এসেছে। মুকলীধর বসু পত্রিকা সম্পাদনাকালে এইসব ব্যাপারগুলি স্মরণে রাখতেন।

পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে মুরলীধর থানা, পুলিশ করতে বাধ্য হন। 'কালিকলমে'-র দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় মহেন্দ্রনাথ রায়, যাঁর ছদ্মনাম নিরুপম গুপ্ত, লেখেন 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' নামে একটি গল্প। এছাড়া দ্বিতীয় বর্ষের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 'কালিকলমে' প্রকাশিত হয় সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস। তার নাম 'চিত্রবহা'। পুলিশের চোখে এই দুটি লেখা অশ্লীল বলে চিহ্নিত হয়। পুলিশ হানা দেয় 'কালিকলম' অফিসে। মুরলীধর ও শৈলজানন্দকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাঁরা পুলিস কোর্টে আনীত হলে অবশ্য জামিন পান। মামলা ওঠে জোড়াবাগান কোর্টে। তৎকালীন যাবতীয় পত্রপত্রিকা মুরলীধর ও শৈলজানন্দের সমর্থনে মতপ্রকাশ করে। মামলায় অবশ্য তাঁরা বেকসুর খালাস পান। সাহিত্যের জন্য এই দুর্গতি ভোগ করায় বিব্রত হননি তাঁরা।

মুরলীধর ১৮৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার রসা রোডে। তাঁর পিতৃদেব জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সাহিত্যপ্রাণ ব্যবহারজীবী। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। তাঁর ভগিনী অঘোরকামিনী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাতা। জানেন্দ্রনাথের বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অদূরবর্তী শ্রীপুর গ্রামে। নিতান্ত কৈশোরেই মুরলীধর পিতৃহারা হলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহসান্নিধ্যে আসেন। যথাসময়ে ইতিহাসে এম. এ. পাশ করে তিনি ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন।

যৌবনেই মুরলীধর দেশহিতব্রতে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর সাহিত্যচর্চাও শুরু হয় তখন থেকে। তৎকালীন যাবতীয় লেখক ছিলেন মুরলীধরের বন্ধু। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'মুরলীদা' বলে ডাকতেন।

সাহিত্যসেবা যাঁর ব্রত, লক্ষ্মীর কৃপালাভে তিনি বঞ্চিত হন। মুরলীধর আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে আপন আদর্শে অবিচল থেকে সাহিত্যচর্চা, সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা এবং জনসেবার কাজ চালিয়ে গেছেন। এককথায় তিনি ছিলেন সাহিত্যতাপস তাঁর স্ত্রী নীলিমা বসু 'কল্লোল' পত্রিকার লেখিকা ছিলেন।

মুরলীধর ১৯৬০ সালের ২৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন তাঁর মধ্যগ্রামের (উত্তর ২৪ পরগণা) ভদ্রাসনে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের একজন অনলস সাহিত্যব্রতীর জীবনাবসান ঘটল। তিনি বেঁচে থাকবেন 'কালিকলম' পত্রিকার জন্য। এই পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে নবযুগ সৃষ্টির পথ তৈরি করে দেয়। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' -এই পত্রিকা দুটি একইসঙ্গে উচ্চারিত হলেও 'কল্লোল' নিয়ে যত লেখা হয়েছে, 'কালিকলম' নিয়ে তা হয়নি। এ বড় দুঃখের ঘটনা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অনেকখানি জায়গা ব্যয় করেছেন 'কালিকলমে'র আলোচনায়। কিন্তু তারপর? সম্প্রতি মুরলীধর বসুর পুত্র সুব্রত বসু 'মুরলীধর বসু জীবন ও সাহিত্য' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করলো

সৃষ্টিসন্ধান